ম্যানগ্রোভ সিলভিকালচার বিভাগের উদ্ভাবিত প্রযুক্তিসমূহ

ড. মো. মাসুদুর রহমান
বিভাগীয় কর্মকর্তা

এস এম মোশফেকা হাছনীন
সিনিয়র রিসার্চ অফিসার

আসম হেলাল উদ্দীন আহম্মেদ সিদ্দিকী
রিসার্চ অফিসার

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
ম্যানগ্রোভ সিলভিকালচার বিভাগ
বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনস্টিটিউট
খুলনা, অক্টোবর ২০১৩

১। প্রযুক্তির নাম ঃ বাংলাদেশ সুন্দরবনের প্রধান প্রধান প্রজাতির নার্সারি উত্তোলন কৌশলঃ

ছবি-১। কেওড়া প্রজাতির উত্তোলিত নার্সারি।

১.১। প্রযুক্তির বর্ণনাঃ বাংলাদেশ সুন্দরবনের প্রধান ১৬টি ম্যানগ্রোভ প্রজাতি যথা- বাইন, মরিচা বাইন, সাদা বাইন, সুন্দরী, কাকড়া, সিংড়া, খলসী, গরান, আমুর, গর্জন, গেওয়া, কেওড়া, ছৈলা, পশুর, হেঁতাল, কিরপার নার্সারি উত্তোলন কৌশল উদ্ভাবনের মাধ্যমে কম গাছ-পালা বিশিষ্ট উপকূলীয় অঞ্চলে সার্থক বনায়ন করে উদ্ভিজ্জের সমাগম ও পরিবেশীয় উন্নয়ন তথা জীববৈচিত্রের সংরক্ষণ সম্ভব।

১.২। যে এলাকার জন্য ঃ উপকুলীয় অঞ্চল

১.৩। প্রযুক্তির প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ ঃ প্রধান প্রধান ম্যানগ্রোভ প্রজাতির পরিপক্ক বীজ/ প্রপাগিউল যথা সময়ে যথা নিয়মে উপযুক্ত মার্তৃবৃক্ষ হইতে সংগ্রহ ও বাছাই এবং সময়মত নার্সারিতে চারা উত্তোলন। সহজে চারা উত্তোলন,উন্নতমানের চারা প্রাপ্তি, স্বল্পমূল্যে চারা উৎপাদন, বাগান সৃজনের জন্য সময়মত পর্যাপ্ত পরিমান চারা সরবরাহের নিশ্চয়তা, উৎপাদিত চারা সহজে পরিবহনযোগ্য, উৎপাদিত চারার টিকে থাকার হার অধিক এবং উদ্ভাবিত প্রযুক্তিটি সহজে বাস্তবায়নযোগ্য।

১.৪। নার্সারি উত্তোলনঃ

ছবি-২ ।সুন্দরী বৃক্ষের সংগৃহিত ফল ।

ছবি-৩ । গোলপতা গাছের সংগৃহিত বীজ ।

ছবি-৪ । আমুর গাছের পরিপক্ক ফল ।

ছবি-৫ । পশুর বৃক্ষের সংগৃহিত বীজ ।

ছবি-৬ । সংগৃহিত পরিপক্ক ধুন্ধুল বীজ ।

ছবি-৭ । ভাতকাঠি গাছের সংগৃহিত প্রপাগিউল বা বীজ ।

ছবি-৮ । ঝানা বা গর্জন গাছের প্রপাগিউল বা বীজ ।

ছবি-৯ । গরান গাছের সংগৃহিত প্রপাগিউল বা বীজ ।

ছবি-১০ । বিভিন্ন প্রজাতির উত্তোলিত ম্যানগ্রোভ নার্সারি ।

ছবি-১১ । কাকড়া গাছের উত্তোলিত নার্সারি ।

ছবি-১২ । মরিচা বাইন প্রজাতির উত্তোলিত নার্সারি ।

ছবি-১৩ । বকুল কাকড়া প্রজাতির উত্তোলিত নার্সারি ।

ছবি-১৪ । ম্যানগ্রোভ প্রজাতির উত্তোলিত নার্সারি ।

ছবি-১৫ । আমুর প্রজাতির উত্তোলিত নার্সারি ।

ছবি-১৬ । পশুর প্রজাতির উত্তোলিত নার্সারি ।

ছবি-১৭ । ম্যানগ্রোভ প্রজাতির উত্তোলিত নার্সারি ।

ম্যানগ্রোভ প্রজাতির চারা উত্তোলন দুইভাবে করা হয় যথা-

১) পলিব্যাগ নার্সারি

২) বেড নার্সারি

১) পলিব্যাগ নার্সারি যখন পলিব্যাগে চারা উত্তোলন করা হয় তখন তাকে পলিব্যাগ নার্সারি বলে ।

- চারা এক স্থান হতে অন্য স্থানে সহজে সরানো যায় ।
- চারা রোপণ করলে কম মারা যায় ।

২) বেড নার্সারি

- সরাসরি মাটিতে বেড তৈরী করে চারা উত্তোলন করা হয় ।
- অনেক সময় বেডে চারা উত্তোলন করে পলিব্যাগে স্থানান্তর করা হয় ।
- বেড নার্সারী তৈরী করতে খরচ কম পড়ে ।
- বেডে বেশী চারার সংকুলান হয় ।

(ক) নার্সারীর স্থান নির্বাচন ঃ

উন্নতমানের চারা উত্তোলনের জন্য নার্সারীর স্থান নির্বাচন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় । এক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত বিষয়গুলি বিবেচনায় রাখতে হবে :-

- পর্যাপ্ত আলো বাতাস পূর্ণ সমতল আদ্রভূমি ।

- নার্সারীর স্থানে যাতায়াত এবং মালামাল ও চারা পরিবহনের জন্য যোগাযোগ ব্যবস্থা ।
- ম্যানগ্রোভ নার্সারীতে সেচ সুবিধার জন্য নার্সারির ধারে নদী, খাল, পুকুর, ডোবা ইত্যাদি থাকা আবশ্যক ।
- উর্বর পলি মাটি এবং মাটির পি এইচ ৬.০ -৮.০ হওয়া ভাল ।

(খ) আদর্শ ম্যানগ্রোভ নার্সারীর পরিমাপ ঃ

- চারা উত্তোলনের পরিমানের উপর ভিত্তি করে নার্সারীর আয়তন ঠিক করতে হবে ।
- সাধারনতঃ নার্সারীর মাঝখানে চলাচলের পথ এবং প্রতি পার্শ্বে পানি সেচ ও নিষ্কাশনের জন্য এক ফুট গভীর ও এক ফুট চওড়া ড্রেনের ব্যবস্থা রাখতে হবে ।
- চারা উত্তোলনের জায়গা বিভিন্ন ব্লকে ভাগ করতে হবে এবং প্রতিটি ব্লকে ১০-১২ টি বেড থাকবে ।
- প্রতিটি সীড বেড ৪০´ X ৪´ (১২ মি. X ১.২ মি) আকারের হবে । তবে এ ধরণের স্থান পাওয়া না গেলে বেডের দৈর্ঘ্য কমিয়ে ২০ ফুট বা ১০ ফুট পর্যন্ত করা যেতে পারে ।
- দু'টি বেডের মাঝখানে ১৮ ইঞ্চি পরিমান ফাঁকা স্থান থাকতে হবে ।
- নার্সারির চারিদিকে ১.৫ মিটার থেকে ২.০মিটার চওড়া এবং ১.৫ মিটার থেকে ২.০মিটার উঁচু মাটির পরিদর্শন পথ তৈরী করতে হবে যা প্লাবন বা জোয়ার ভাটা নিয়ন্ত্রনের কাজে ব্যবহৃত হবে ।

(গ) নার্সারীর জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ ও সরমঞ্জাদি ঃ

- ছিদ্রযুক্ত পলিথিন ব্যাগ
- মাটি
- গোবর সার
- রাসায়নিক সার
- তারের চালুনি
- বেলচা, কোদাল, দা, ছুরি, সাবোল, নিড়ানী
- বাঁশের ঝুড়ি
- বাঁশ
- ঝর্ণা
- প্লাষ্টিক ট্রে
- বালতি
- করাত
- স্প্রে মেশিন
- কীট/ছত্রাক নাশক

(ঘ) পলিব্যাগ বসানোর জন্য বেড তৈরী ঃ

- আদ্র সমতল স্থানে নার্সারী বেড (৪০´ X ৪´) পূর্ব হতে পশ্চিমে লম্বালম্বিভাবে স্থাপন করতে হবে ।
- বেডের ধার ১০-১৫ সে.মি. উঁচু করে বাঁশের খুঁটি পুঁতে কাইম আটকাতে হবে ।
- নার্সারী বেড কোদাল দ্বারা ভালমত চেঁচে পরিস্কার করে সমান করে নিতে হবে ।

(ঙ) মাটি সংগ্রহ ঃ

- ভূমির উপরিভাগ হইতে বেলে দোয়াঁশ মাটি সংগ্রহ করতে হবে ।
- পাতা পঁচা সারযুক্ত বনাঞ্চলের বা গাছপালা ঝোপঝাড়ের নিচের মাটি ভাল ।
- আগাছার শিকড় ও আবর্জনা মুক্ত মাটি হতে হবে ।
- শীতের শেষে ও বসন্তের শুরুতে মাটি সংগ্রহ করে রাখতে হবে ।

(চ) মাটি ও গোবর সার মিশ্রন ঃ

- সংগৃহিত মাটি এবং পঁচা গোবর সার ৩ঃ১ অনুপাতে অর্থাৎ তিন ভাগ মাটির সাথে এক ভাগ গোবর সার স্তরে স্তরে সাজিয়ে কমপক্ষে এক মাস স্তুপাকারে রেখে দিতে হবে ।
- স্তুপের উপরে গজানো আগাছা পরিস্কার করে রাখতে হবে ।

- পরবর্তিতে কোদাল দিয়ে স্তুপের মাটি কুপিয়ে কুপিয়ে ঝুর ঝুর করতে হবে ।
- ঝুরা মাটি ও গোবর সারের মিশ্রন বেলচার সাহায্যে মাজারি আকারের ছিদ্রযুক্ত তারজালির দ্বারা ছেঁকে নিতে হবে ।
- এভাবে আবর্জনা বিহীন মাটি ও গোবর সারের মিশ্রন তৈরী হয়ে গেল ।

(জ) পলিব্যাগে মাটি ভর্তি করা ঃ

- বিভিন্ন আকারের পলিব্যাগ নার্সারীতে ব্যবহার করা হয় । যেমন- ৬" X ৪", ৭" X ৫", ৯" X ৬" ইত্যাদি ।
- ছিদ্রযুক্ত পলিব্যাগে মাটি ও গোবর সারের মিশ্রন ভর্তি করতে হবে ।
- বাম হাতে পলিব্যাগ ধরে ডান হাতে আস্তে আস্তে মাটির মিশ্রন পলিব্যাগে ভরতে হবে এবং হাতের আঙ্গুলের সাহায্যে চাপ দিতে হবে । তারপর পলিব্যাগের উপরিভাগ দুই হাত দিয়ে ধরে আস্তে আস্তে দুই তিনবার ঝাকুনী দিতে হবে এবং মাটি পলিব্যাগে কানায় কানায় ভরতে হবে ।
- মাটির মিশ্রন ভর্তি ব্যাগগুলি নার্সারী বেডে সুন্দর করে খাড়াভাবে সাজাতে হবে ।

(ঝ) পলিব্যাগে বীজ/প্রপাগিউল বপন ঃ

- বীজ বপনের আগে পলিব্যাগে হাল্কা পানি দিয়ে নেয়া ভাল ।
- পলিব্যাগে ছোট গর্ত করে ১/২ টি করে বীজ বপন করতে হবে ।
- বীজ দেয়ার পর মাটি দিয়ে বীজ ঢেকে দিতে হবে । সাধারণতঃ বীজের আয়তন যত তত পরিমান মাটি বীজের উপর দিতে হবে ।
- বীজ বপনের পর হাল্কা পানি দিয়ে ভিজিয়ে দিতে হবে । অতঃপর বেডে নিয়মিত পানি দিতে হবে ।

(ঞ) খোলা মাটিতে বেড তৈরী ঃ

- পলিব্যাগ নার্সারী বেডের মতো খোলা মাটিতে সীড বেডও ৪০´ লম্বা এবং ৪´ প্রস্থ হয় ।
- নার্সারী বেডের মাটি আদ্র ও সমতল হতে ৩০-৪০ সে.মি. পর্যন্ত গভীর করে কাদাময় মাটি তৈরী করতে হবে ।
- প্রতিটি মাটির সীড বেডে ৪০ কেজি গোবর সার এবং ৪০ কেজি আবর্জনা পঁচা সার মাটি কোপানোর সময় প্রয়োগ করে ভালভাবে মিশিয়ে দিতে হবে ।
- কোন কোন ম্যানগ্রোভ প্রজাতি যেমন-গোলপাতা সরাসরি তৈরীকৃত নার্সারির কাদামাটিতে পুঁতে দেওয়া হয় । ইহাকে ডিবলিং পদ্ধতি বলা হয় ।

(চ) বেডে গজানো চারা পলিব্যাগে রোপন ঃ

- প্রজাতিভেদে যেমন কেওড়া, ছৈলা প্রভৃতি গাছের চারা মাটির বেডে গজানোর পরে প্রতিটি চারার যখন ৪ টি করে কচি পাতা বেরোবে ঠিক তখনই চারা পলিব্যাগে স্থানান্তর করতে হবে ।
- বিকেল বেলা চারা স্থানান্তরের উপযুক্ত সময় । চারা বেড থেকে উঠানোর আধঘন্টা আগে পানি দিয়ে বেড ভালভাবে ভিজিয়ে দিতে হবে ।
- প্রথমে সরু কাঠির সাহায্যে চারা এমনভাবে তুলতে হবে যেন শিকড় ছিড়ে না যায় এবং শিকড়ে কিঞ্চিত মাটি লেগে থাকে ।
- চারাগুলি আলতো করে ট্রে-তে নিয়ে প্রস্তুতকৃত পলিব্যাগে রোপন করতে হবে ।
- প্রথমে পলিব্যাগ ভাল করে ভিজিয়ে কাঠি দিয়ে ব্যাগের মাঝখানে চারার শিকড়ের মাপে আন্দাজমত একটি গর্ত করে চারাটি সাবধানে গর্তে বসিয়ে মাটি দিয়ে সুন্দরভাবে ভরাট করে দিতে হবে ।

- চারা স্থানান্তরের পর বেডের উপর শেড দিয়ে ছায়ার ব্যবস্থা করে দিতে হবে ।

(ছ) ট্রে-তে চারা উত্তোলন ঃ

- ছোট বা ক্ষুদ্র বীজ যেমন-কিরপা বীজের চারা ট্রে-তে উত্তোলন করা হয় ।
- ছিদ্রযুক্ত একটি প্লাষ্টিকের ট্রে-তে পাতলা মার্কিন কাপড় বা নিউজপ্রিন্ট কাগজ বিছিযে চাপ দিয়ে স্থাপন করে নিতে হবে ।
- বিশোধিত বালি বা মাটি ঠান্ডা করে ট্রে টি ভরাট করতে হবে এবং কাঠি বা স্কেলের সাহায়্যে হালকা চাপে ট্রের বালি বা মাটির উপরের স্তর সমান করে দিতে হবে ।
- এবার বীজ বালির সাথে মিশিয়ে (১ ভাগ বীজ ২ ভাগ বালি) ট্রের উপর সমানভাবে ছড়িয়ে দিতে হবে ।
- তারপর মিহি বালির প্রলেপ বীজের উপর ছিটায়ে দিতে হবে ।
- এরপর একটি বড় গামলায় ২ ইঞ্চি পরিমান পানি নিয়ে বীজ ট্রে টি গামলার ভিতরে বসিয়ে দিতে হবে যাতে বীজ ট্রের বালি বা মাটি গামলা থেকে পানি শোষণ করে সম্পূর্ণ ভিজে যায় ।
- ভিজা বীজ ট্রে টি পাতলা সাদা পলিথিন কাগজ দিয়ে ঢেকে দিয়ে অংকুরোদগমের জন্য ছায়ায় রেখে দিতে হবে ।
- কয়েকদিনের মধ্যে অংকুরোদগম শুরু হলে পলিথিন কাগজ সরিয়ে ফেলতে হবে ।
- অতঃপর চারা ৪ পাতার হলে দ্রুত পলিব্যাগে স্থানান্তর করতে হবে ।

১.৫ । ম্যানগ্রোভ নার্সারিতে চারা পরিচর্যা

নার্সারি বেডে বা পলিব্যাগে বীজ বপন বা চারা রোপণের পর যথাযথ পরিচর্যা করা প্রয়োজন । সুস্থ, সবল এবং নীরোগ চারা পাওয়ার জন্য নিম্নবর্ণিত পরিচর্যাসমূহ করতে হবে :-

(ক) পানি সেচ ঃ

- বীজ বা চারা রোপনের পর নিয়মিত ও পরিমানমত পানি সেচ দিতে হবে ।
- ঝর্ণা বা স্প্রে মেশিনের সাহায্যে পানি সেচ দিতে হবে ।
- সকালে বা বিকালে নার্সারী বেডে পানি দিতে হবে ।
- কোন মতেই নার্সারীতে প্রয়োজনের অতিরিক্ত পানি সেচ দেয় উচিত নয় ।

(খ) আগাছা বাছাই ঃ

- মাটির বেড বা পলিব্যাগে বীজ অংকুরোদগমের পর হতেই আগাছা বাছাই করতে হবে ।
- সাধারণতঃ প্রতি দুই সপ্তাহ অন্তর অন্তর চোখা কাঠির সাহায্যে শিকড়সহ আগাছা উঠিয়ে ফেলতে হবে ।
- আগাছা বাছাই এর আগে হালকা পানি দিয়ে বেড ভিজায়ে নিতে হবে ।

(গ) আচ্ছাদন প্রদান (সূর্যালোক নিয়ন্ত্রণ) ঃ

- অনেক প্রজাতির বীজের অংকুরোদগম এবং চারার বৃদ্ধির জন্য প্রাথমিক পর্যায়ে বেডের উপর ছায়া প্রদানের প্রয়োজন পড়ে ।
- সাধারণতঃ ছন, বাঁশের চাটাই, খড় দিয়ে আচ্ছাদনের চাল তৈরী করা যায় ।
- চালা বেডের উপর দক্ষিণ দিকে ঢালু রেখে খুটির ফ্রেমের উপর স্থাপন করতে হবে ।

- কোনক্রমেই চালা নার্সারী বেডের উপর দীর্ঘদিন রাখা উচিৎ নয় । তাহলে চারা লিকলিকে ও দুর্বল হয়ে যাবে ।

(ঘ) মালচিং ঃ

- মাটি হতে রস যাতে বাষ্প হয়ে যেতে না পারে এবং মাটিতে যাতে তাপ বৃদ্ধি পায় সেজন্য খড় ইত্যাদি দিয়ে বেড বা পলিব্যাগ ঢেকে দেয়া হয় ।
- সাধারনতঃ আচ্ছাদনের পরিবর্তে নার্সারীতে মালচিং ব্যবহার করা হয় ।

(ঙ) শুন্যস্থান পূরণ ঃ

- নার্সারীতে পলিব্যাগে সরাসরি বীজ বপনের ফলে কোন ব্যাগে একাধিক চারা গজায় আবার কিছু ব্যাগ চারাশুন্য থাকে ।
- চারা গজানোর কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই ব্যাগে প্রয়োজনের অতিরিক্ত চারা কাঠি দিয়ে উঠিয়ে শুন্যব্যাগে রোপণ করতে হবে ।
- একের অধিক চারা পলিব্যাগে রাখা ঠিক নয় কারণ বেশী চারা থাকলে বৃদ্ধি তরান্বিত হয় না ।
- পলিব্যাগে একাধিক চারা থাকলে একটি সুস্থ, সবল চারা রেখে বাকীগুলো তুলে ফেলে দিতে হবে ।

(চ) সার প্রয়োগ ঃ

- কোন কোন সময় চারার প্রয়োজনীয় বৃদ্ধির জন্য রাসায়নিক সার প্রয়োগ করা দরকার হয় । সাধারনতঃ চারায় ইউরিয়া, ফসফেট ও পটাস সার প্রয়োগ করা হয় ।
- ইউরিয়া সার পানিতে গলে যায় বলে পানিতে মিশিয়ে ঝর্ণার সাহায্যে এবং ফসফেট ও পটাস সার ছিটায়ে প্রয়োগ করা যায় ।
- প্রতিটি চারার বেডে (৪০´ X ৪´) ৫০০ গ্রাম ইউরিয়া, ২৫০ গ্রাম ফসফেট এবং ২৫০ গ্রাম পটাস সার প্রয়োগ করলে ভাল ফল পাওয়া যায় ।

(ছ) পলিব্যাগের চারা পূনরায় সাজানো ঃ

- পলিব্যাগে যে বীজ বপন বা চারা রোপণ করা হয় তা একই সাথে অংকুরোদগম বা বড় হয় না । কাজেই বীজ/প্রপাগিউল বপন বা চারা রোপণের ২০/৩০ দিন পর দেখা যায় যে কোন চারা বড় আবার কোন চারা ছোট । এমতাবস্থায় বেডে বড় ও ছোট চারা আলাদাভাবে পুনরায় সাজাতে হবে ।
- চারার উচ্চতা অনুযায়ী বেডের প্রথমে বড় চারা তারপর ক্রমশঃ ছোট চারা সাজাতে হবে ।
- তিন মাস অন্তর ব্যাগের চারা গ্রেডিং করে পুনঃ সাজিয়ে নিয়মিত পরিচর্যা করলে নার্সারীর সকল চারা সুস্থ, সবল, সতেজ ও সম-আকৃতির হবে ।

(জ) শিকড় ছাঁটাই ঃ

- চারা বড় হওয়ার সাথে সাথে পলিব্যাগের বাইরে শিকড় এসে যায় ।
- চারা রোপণের পূর্বে ধারালো কাঁচি দিয়ে ব্যাগের গা ঘেসে শিকড় ছাঁটাই করে দিতে হবে ।

(ঝ) চারা শক্তকরণ ঃ

- বনায়ন বা রোপণের অন্তত এক মাস পূর্বে চারাগুলো বেডে নাড়িয়ে সাজাতে হবে ।
- বেডের উপর শেড থাকলে ছায়া সরিয়ে ফেলতে হবে ।

- পরিমিত পানির চেয়ে কম পানি সেচ দিতে হবে। অর্থাৎ ২/৩ দিন পর পর পানি সেচ দিতে হবে।
- পলিব্যাগের চারার মূল ছাঁটাই এর মাধ্যমে চারা শক্ত করা যায়।

১.৬। প্রযুক্তির ঝুঁকির বিবরণ ঃ উপকূলীয় অঞ্চলে এ প্রযুক্তি প্রয়োগে কোন ঝুঁকি নেই।
১.৭। পরিবর্তনশীল আবহাওয়ায় উপযোগিতা ঃ ম্যানগ্রোভ প্রজাতির পর্যাপ্ত চারা উত্তোলনের মাধ্যমে উপকূলীয় নিম্নাঞ্চলে বনায়ন সহজ হবে ফলে পরিবেশ ও প্রতিবেশ উন্নয়নের মাধ্যমে জলবায়ু পরিবর্তন জনিত সমস্যা ও দূর্যোগ মোকাবেলায় সক্রিয় ভূমিকা পালন করবে।

১.৮। নারীদের অংশগ্রহণের উপযোগিতা ঃ নার্সারি উত্তোলনের মাধ্যমে অবসর সময়ে কাজের সুযোগ সৃষ্টি হবে ও অর্থ উপার্জনের সুযোগ সৃস্টি হবে, নারীর ক্ষমতায়ন বাড়বে এবং আর্থ সামাজিক উন্নয়ন উন্নয়ন ঘটবে।
১.৯। খাদ্য নিরাপত্তায় অবদান ঃ উত্তোলিত নার্সারির চারা বিক্রয়লব্ধ অর্থ আর্থ সামাজিক উন্নয়নে সহায়ক ভূমিকা রাখবে।

২। প্রযুক্তির নাম ঃ জলবায়ুর পরিবর্তন তথা বৈশ্বিক উষ্ণায়ন প্রভাব মোকাবেলায় আইলা দূর্গত এলাকায় বেড়ী বাঁধে নির্বাচিত প্রজাতির পরিকল্পিত বনায়ন কৌশলঃ

ছবি-১৮। চরে কেওড়া বনায়ন ।

ছবি-১৯। বেড়ী বাঁধের ঢালে কেওড়া বনায়ন।

ছবি-২০। চরে কাকড়া প্রজাতির বাগান ।

ছবি-২১। সুন্দরবনে বকুল কাকড়া প্রজাতির বনায়ন।

ছবি-২২ । সুন্দরবনে চরে ম্যানগ্রোভ প্রজাতির বনায়ন ।

ছবি-২৩ । সুন্দরবনে ম্যানগ্রোভ প্রজাতির বনায়ন ।

২.১ । প্রযুক্তির বর্ণনাঃ বেড়ী বাঁধ ব্যবস্থাপনার সাথে পরিকল্পিত বনায়নের মাধ্যমে আইলা, সিডর ও জলোচ্ছ্বাস এর হাত হতে পরিবেশ সুরক্ষা করা সম্ভব । এলক্ষে বন্যা দূর্গত এলাকা ও উপকূলীয় বাঁধ এবং সংলগ্ন বেড়ী বাঁধের ধারে পরিকল্পিত নির্ধারিত প্রজাতির গাছ বনায়নের মাধ্যমে জলবায়ু পরিবর্তনের ও আকস্মিক বন্যা, জলোচ্ছাস, সিডর ও আইলার প্রকোপ হতে এতদাঞ্চলকে রক্ষা করা এবং সমূহ বিপদ হতে স্থানীয় জনগণকে উদ্ভূত পরিস্থিতি মোকাবেলা করা সম্ভব । মহাসড়ক, স্থানীয় রাস্তা এবং বেড়ী বাঁধের দুধারে টেরিসটোরিয়াল প্রজাতি এবং বেড়ী বাঁধের ঢালে- নদীর কিনারে ম্যানগ্রোভ প্রজাতির দ্বারা বনায়ন করা উত্তম ।

এক্ষেত্রে বৃক্ষ রোপণের জন্য প্রজাতি নির্বাচন, বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি ও নকসা অবলম্বন এবং সময়মত বনায়ন করা আবশ্যক । এরুপ পরিস্থিতি মোকাবেলায় বাঁধের ধারে ২ বা ৩ স্তর বিশিষ্ট বনায়ন করা আবশ্যক, যেমন বাঁধ ও রাস্তার পার্শ্বে রোপণের জন্য তাল, নারিকেল, খেজুর, বাবলা, জারুল, খৈয়া বাবলা, তেঁতুল একটির পর একটি ৫মিটার অন্তর রোপণ করা যেতে পারে । বাঁধের ঢালে প্রথমে ম্যানগ্রোভ প্রজাতি যেমন সুন্দরী, বাইন, কেওড়া, গরাণ, খলসি ও গোলপাতার বাগান সৃজন করা যেতে পারে । বর্ষা মৌসুমে বিশেষ করে জুন থেকে সেপ্টেম্বর মাসের মধ্যে বনায়ন করা আবশ্যক ।

এভাবে বনায়নের মাধ্যমে বেড়ী বাঁধ ও রাস্তা সুরক্ষার সাথে সাথে পরিবেশ উন্নয়ন ও জানমালের সুরক্ষা এবং গোখাদ্য ও অন্যান্য ফলজ বনজ ও জ্বালানী চাহিদা পূরণ করে জলবায়ুর পরিবর্তন তথা উষ্ণায়ন এর প্রভাব হতে উপদ্রুত অঞ্চলকে সুরক্ষা করা সম্ভব । যার ফলে, উপকূলীয় ইকোসিস্টেম অর্থাৎ পরিবেশ ও প্রতিবেশ সুরক্ষিত হবে ।

২.২ । যে এলাকার জন্য ঃ উপকুলীয় অঞ্চল

২.৩ । প্রযুক্তির প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ ঃ ভূমি ক্ষয় রোধ, রাস্তা ও বেড়ি বাঁধ ব্যবস্থাপনা, জ্বালানি ও কাঠের চাহিদা পূরণ, ফল, ফুল, খাদ্য, ঔষধের চাহিদা মেটানো, দূর্যোগ প্রতিরোধ, উপকূলীয় জনগোষ্ঠির পুষ্টি চাহিদা পূরণ, পশু পক্ষীর খাবার যোগান, ঝড়, বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও মরুকরণ রোধ, পরিবেশ ও আর্থ সামাজিক উন্নয়ন এবং উদ্ভাবিত প্রযুক্তিটি সহজে বাস্তবায়নযোগ্য ।

২.৪ । বনায়ন কৌশল ঃ

সফলভাবে বাগান উত্তোলনের জন্য নিম্নোক্ত পদ্ধতি সমূহ অনুসরণ করতে হবে ঃ-

(ক) স্থান নির্বাচন ঃ

- যে এলাকায় বাগান সৃজন করতে হবে সেই এলাকা ২/৩ মাস পূর্বেই নির্বাচন করে রাখতে হবে ।

- স্থান নির্বাচনের সময় জমির মালিকানা, জমির শ্রেণী ও বনায়নের উপযোগীতা আছে কিনা যাচাই করতে হবে ।
- প্রজাতি ভেদে সঠিক স্থান (জমি) নির্বাচন করতে হবে ।
- আবার স্থান ভেদে সঠিক প্রজাতি নির্বাচন করতে হবে ।

(খ) গাছ লাগানোর পূর্বে নির্বাচিত এলাকা জরিপ এবং পরিকল্পনা গ্রহন করতে হবে :-

- কি পরিমান জমি বনায়ন করা হবে ।
- ভূমির প্রকার, অবস্থান এবং মাটির প্রকৃতি ।
- বর্তমান গাছপালা এবং অতিতের গাছপালা ।
- নির্বাচিত এলাকায় কোথায় কি জাতের চারা রোপণ করা যায় ।
- নির্বাচিত জমি কতটুকু প্রস্তুত করতে হবে তা নির্ধারণ করা ।
- রাস্তা, পায়ে চলার পথ, পানি সেচের ব্যবস্থা ইত্যাদি ।

(গ) গাছ লাগানোর স্থান প্রস্তুতকরণ ঃ

- নির্বাচিত এলাকার জঙ্গল, লতাপাতা ও অপ্রয়োজনীয় গাছপালা জানুয়ারী মাসে একবার কেটে ফেলতে হবে ।
- বড় গাছের মোথা থাকলে তুলে ফেলতে হবে ।
- কর্তিত জঙ্গল শুকিয়ে গেলে প্রয়োজনবোধে আগুন দ্বারা পুড়িয়ে ফেলতে হবে ।
- চারা লাগানোর পূর্বে যদি পুনরায় আগাছা জন্মে তাহলে আবার আগাছা ২য় বার পরিস্কার করতে হবে ।

(ঘ) চারা রোপণের সময় ঃ

- বর্ষা মৌশুমের শুরুতে অর্থাৎ মে-জুন মাসে চারা লাগানোর উপযুক্ত সময় । তবে আগষ্ট-সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত চারা লাগানো যেতে পারে ।
- উপকূলীয় এলাকায় বর্ষাকালের পর সেপ্টেম্বর মাসে চারা লাগানো ভাল ।

(ঙ) স্টেকিং করা ঃ

- স্টেকিং করার মূল উদ্দেশ্য হলো চারা রোপণের স্পট চিহ্নিতকরণ, রোপিত চারাকে খুঁটির সাথে বেধেঁ রাখা এবং মরে যাওয়া চারার স্থান চিহ্নিতকরণ ।
- নির্বাচিত স্থান প্রস্তত করার পর সম্পূর্ণ এলাকায় মে মাসের প্রথম ভাগেই চারা রোপণের স্পটগুলি চিহ্নিতকরণের জন্য নিয়মিত দুরত্বে স্টেকিং করতে হবে ।
- এ কাজে ১ মি. লম্বা বাঁশের সরু খুঁটি বা কোন গাছের সরু ডালা ব্যবহার করা যেতে পারে ।

(চ) বৃক্ষের প্রজাতি নির্বাচন ঃ

- সঠিক স্থানে সঠিক প্রজাতির চারা রোপণ বনায়ন সফলতার পূর্বশর্ত ।
- ভূমির প্রকৃতি, মাটির গঠন, স্থানীয় চাহিদা ও জলবায়ুর উপর নির্ভর করে বৃক্ষের প্রজাতি নির্বাচন করতে হবে ।

(ছ) চারা রোপণের জন্য গর্ত তৈরী করা ঃ

- বর্ষা শুরু হওয়ার আগে প্রতিটি ষ্টেকিং করা খুঁটির গোড়ায় গর্ত তৈরী করতে হবে ।
- গর্তের আকার পলিব্যাগের আকার অনুযায়ী তৈরী করতে হবে । ৬" × ৪" আকারের পলিব্যাগের চারার জন্য ১´ × ১´ × ১´ আয়তনের গর্ত তৈরী করতে হবে এবং গর্তের পার্শ্বে খুঁটিগুলি পুঁতে রাখতে হবে, অণ্য চারা যেমন নারিকেল চারার জন্য গর্তের আকার হবে ১.৫´ × ১.৫´ × ১.৫´ ।
- লক্ষ্য রাখতে হবে যেন গর্ত যেন ১৫-২০ দিন ঠিক মত আলো বাতাস পায় ।

(জ) সার প্রয়োগ ঃ

- গর্ত হইতে উঠানো টালকৃত মাটির নীচের অংশ প্রথমে এবং উপরের অংশ পরে দিয়ে গর্ত ভরাট করতে হবে ।
- প্রতিটি গর্তে ১ কেজি গোবর বা কম্পোস্ট সার, ২০ গ্রাম ইউরিয়া, ২০ গ্রাম টিএসপি এবং ১০ গ্রাম এমপি সার প্রতিটি গর্তে প্রয়োগ করে কোদাল দ্বারা মাটির সাথে ভালভাবে মিশাতে হবে ।
- চারা লাগানোর ন্যুন্যতম ১০-১৫ দিন পূর্বে সার প্রয়োগ করতে হবে ।
- সারের পরিমাণ মাটির প্রকার ভেদে কম বেশী হয়ে থাকে ।

(ঝ) চারা লাগানোর প্রয়োজনীয় দুরত্ব ঃ

- চারার মধ্যবর্তী ও সারির দুরত্ব কত হবে তা নির্ভর করে কি জাতের চারা ও কি কাজে ভবিষ্যতে ব্যবহার হবে এবং থিনিং প্লানের উপর ।
- সাধারণতঃ বন বৃক্ষের চারার জন্য উত্তম দুরত্ব হলো ৬´ × ৬´ বা ৮´ × ৮´ ।
- খুব কাছাকাছি চারা লাগানো উচিত নয় এতে চারা লিকলিকে হয়ে যায় এবং গাছের বৃদ্ধি হয় না ।
- বড় আকারের ফলজ গাছের বেরায় দুরত্ব ক্ষেত্র বিশেষে ২০´-৩০´ হওয়া উত্তম ।

(ঞ) চারা রোপণ পদ্ধতি ঃ

আমাদের দেশে সাধারণতঃ তিন প্রকারের চারা পাওয়া যায় যার রোপনের পদ্ধতি নিম্নে প্রদান করা হলো:-

(১) পলিথিন ব্যাগের চারা ঃ

- নার্সারী থেকে চারাগুলো সতর্কতার সাথে বাগান করার স্থানে নিয়ে যেতে হবে ।
- চারা লাগানোর সময় ব্লেড বা ধারাল ছুরি দিয়ে পলিথিন ব্যাগটি কেটে নিয়ে ব্যাগটি ফেলে দিতে হবে । তারপর জমাট বাঁধা মাটিসহ চারাটি গর্তে ঠিকমত বসিয়ে চারপাশের মাটি চারার গোড়ায় সামান্য উঁচু করে চেপে দিতে হবে ।
- খেয়াল রাখতে হবে চারা লাগানোর সময় যেন মাটির বল ভেঙ্গে না যায় এবং চারার শিকড় গর্তের ভিতরে পেঁচিয়ে না যায় ।
- চারা রোপণের পর সহায়ক খুঁটির সাথে রশি দিয়ে বেঁধে দিতে হবে যাতে চারা হেলে যেতে না পারে ।

(২) ষ্ট্যাম্প জাতীয় চারা ঃ

- সাধারণতঃ ৬-৯ ইঞ্চি শিকড় এবং ১ ইঞ্চি পরিমান কান্ড রেখে ষ্ট্যাম্প তৈরী করা হয় ।
- ষ্ট্যাম্প লাগানোর জন্য আগে থেকে কোন গর্ত করার দরকার নেই ।
- একটু বৃষ্টিপাত হলে দা অথবা শাবল দিয়ে চারার শিকড়ের দৈর্ঘ্যের চেয়ে ১ ইঞ্চি বেশী গভীর গর্ত করতে হবে ।
- গর্তে ষ্ট্যাম্প চারাটি বসিয়ে চারপাশের মাটি ভালকরে চেপে দিতে হবে ।
- ষ্ট্যাম্প বসানোর সময় কান্ড ও মূলের সংযোগস্থল মাটির সমতলে রাখতে হবে ।
- সেগুন, শিমুল, জারুল, ছাতিয়ান, গামার গাছের চারার পরিবর্তে ষ্ট্যাম্প ভাল হয় ।

(৩) শিকড় সমেত চারা ঃ

- এ ধরণের চারার বয়স সাধারণতঃ ১-২ বছর হলে নার্সারী হতে তুলে অন্যত্র লাগানো হয় ।
- শিকড় সমেত চারা নার্সারী হতে উত্তোলনের অন্ততঃ একমাস পূর্বে চারা খাসীকরণ করতে হবে ।

- চারার গোড়ার শিকড় এবং প্রধান মূল কাটার ২০-২৫ দিন পর সম্পূর্ণ চারাটি উত্তোলন করতে হবে এবং চারার গোড়ার মাটি কাটা চট, রশি, খড়, পলিথিন, কলাপাতা বা অন্য কিছু দিয়ে আটকিয়ে বেঁধে রাখা হয়।
- উত্তোলনকৃত চারা ১ সপ্তাহ ছায়ায় রেখে দিতে হবে।
- উত্তোলনের সময় চারাটি যতখানি মাটির নিচে থাকে, রোপণের সময়ও চারাটি মাটির ততখানি নিচে দিতে হবে। চারা লাগানোর পূর্বে গোড়ায় জড়ানো বস্তু সরিয়ে ফেলতে হবে।
- এ ধরণের লাগানোর পর পর গোড়ায় পানি দিতে হবে।
- আম, কাঁঠাল ইত্যাদির চারার জন্য এ পদ্ধতি উত্তম।

২.৫। সৃজিত বাগানের পরিচর্যা ও রক্ষণাবেক্ষণ

চারা রোপণের পর এর পরিচর্যা ও রক্ষণাবেক্ষণ একান্ত অপরিহার্য। বনায়ন সফল করতে অন্ততঃ চার বছর পর্যন্ত সতর্কতার সাথে বাগানের চারাগুলো বড় করে তুলতে হবে। চারাগাছের সংরক্ষণ ও পরিচর্যার জন্য নিম্নোক্ত ব্যবস্থাগুলো অনুসরণ করতে হবে ঃ

(ক) পানি সরবরাহ ঃ

- চারা লাগানোর পর পানি দিয়ে চারার গোড়া ভিজিয়ে দিতে হবে।
- বৃষ্টি না হলে প্রয়োজন অনুযায়ী চারার গোড়ায় পানি দিতে হবে।
- শুষ্ক মৌসুমে মাটিতে রস না থাকলে চারা গাছ মারা যেতে পারে তাই নিয়মিত পানি সেচের ব্যবস্থা করতে হবে।

(খ) আগাছা দমন ঃ

- সৃজিত বাগানে প্রচুর আগাছা জন্মায় এবং তা অতি দ্রুত বৃদ্ধি পেয়ে রোপণকৃত চারাকে আচ্ছাদিত করে ফেলে ফলে চারাগুলো দুর্বল হয়ে মারা যেতে পারে।
- এজন্য সৃজিত বাগানে নিয়মিত আগাছা পরিস্কার করা অত্যাবশ্যক।
- আগাছা নিয়ন্ত্রনে রাখতে চারা রোপণের ১ম বছরে ৩ বার এবং পরবর্তী বছর সমূহে ২ বার করে আগাছা পরিস্কার করতে হবে।
- চারা গাছ প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত এ প্রক্রিয়া চালু রাখতে হবে।

(গ) ঘেরাবেড়া দেওয়া ঃ

- গৃহপালিত গবাদিপশু বাগানের চারাগাছ খেয়ে ধ্বংস করে ফেলতে পারে। তাই বড় বাগান এলাকার চারিপাশে কঁচা বা অন্য কোন কাঠ এবং বাঁশ দিয়ে শক্ত করে বেড়া দিতে হবে।
- চারার উচ্চতা বন্য ও গৃহপালিত প্রাণীর নাগালের বাইরে যাওয়া পর্যন্ত বেড়া রাখতে হবে
- বড় ধরণের বাগান সংরক্ষণের জন্য পাহারাদার নিয়োগ করা যেতে পারে।
- ছোট বাগান বা প্রতিষ্ঠানে সৃজিত চারা গবাদিপশুর উপদ্রব হতে রক্ষার জন্য বাঁশের খাঁচা/বেড়া প্রদান করা যেতে পারে।
- ঘেরাবেড়ার উচ্চতা কমপক্ষে ৫ ফুট ও ব্যাস ২ ফুট রাখা দরকার।

(ঘ) মাটি আলগা করণ ঃ

- রোপণকৃত চারার গোড়ার মাটি শক্ত হয়ে গেলে তা মাঝে মাঝে নিড়ানী দ্বারা আলগা করে দিতে হবে।
- এ কাজ সাধারণতঃ বছরে ২ বার করা হয়।

(ঙ) শুন্যস্থান পূরণ ঃ

- চারা রোপণের ১ম বছরে ১০০% জীবিত চারা পাওয়া যায় না। বিভিন্ন কারণে কিছু চারা মারা যায়।
- যেখানে চারা মারা যাবে সেখানে ১ম/২য় বছরে নতুন চারা রোপণের মাধ্যমে পূরণ করতে হবে।
- এজন্য নার্সারিতে পর্যাপ্ত চারা আগে থেকেই বড় ব্যাগে উত্তোলন করে সংরক্ষণ করে রাখতে হবে।
- শুন্যস্থান পূরণের জন্য চারার বয়স কমপক্ষে ১ বছর হওয়া উচিত।

(চ) ডালপালা ছাটাই ঃ

- গাছ একটু বড় হয়ে ক্যানোপি কাছাকাছি মিশে আসলে নিচের দিকে ঝুলে থাকা ডালপালা ধারাল দা দিয়ে কান্ডের খুব কাছাকাছি এবং সমান্তরাল করে কেটে দিতে হবে।
- এভাবে অতিরিক্ত ডালপালা কেটে দিলে গাছের কান্ড সোজা ও বড় হয় এতে ভবিষ্যতে মূল কান্ডটি মূল্যবান কাঠ হিসাবে ব্যবহার করা যায়।
- ছাটাইয়ের সময় মরা, রোগাক্রান্ত ও পোকায় খাওয়া গাছ ও ডালপালা অবশ্যই কেটে পুড়িয়ে ফেলতে হবে।

(ছ) রোগ-বালাই দমন ঃ

- চারাগাছ পোকামাকড় বা ছত্রাক দ্বারা আক্রান্ত হয়ে বিভিন্ন রকমের রোগ বালাই-এর শিকার হতে পারে।
- বেশীরভাগ ক্ষেত্রে চারাগাছের আক্রান্ত অংশ কেটে পুড়িয়ে বা মাটিতে পুতে ফেলতে হবে।
- রোগের পরিমান বেশী হলে কীটনাশক বা ছত্রাকনাশক অনুমোদিত মাত্রায় প্রয়োগ করতে হবে।

২.৬। প্রযুক্তির ঝুঁকির বিবরণ ঃ উপকূলীয় অঞ্চলে এ প্রযুক্তি প্রয়োগে কোন ঝুঁকি নেই।

২.৭। পরিবর্তনশীল আবহাওয়ায় উপযোগিতা ঃ গাছ পালা জন্মাবার ফলে বাঁধ সুরক্ষা হবে এবং ভূমি ক্ষয় রোধ হবে যার পরিপ্রেক্ষিতে জলোচ্ছ্বাস, সিডর, আইলা প্রভৃতি প্রাকৃতিক দূর্যোগের কবল থেকে উপকূলীয় জনগণ রক্ষা পাবে। উপকূলীয় অঞ্চলের জীব বৈচিত্রের উন্নয়নসহ জল বায়ু পরিবর্তন জনিত সমস্যা মোকাবেলায় সহযোগী ভূমিকা পালন করবে।

২.৮। নারীদের অংশগ্রহণের উপযোগিতা ঃ নারীদের কর্মসংস্থানের যথেষ্ট সুযোগ সৃস্টি হবে এবং আর্থ সামাজিক উন্নয়ন ঘটবে ফলে নারীর ক্ষমতায়ন বৃদ্ধি পাবে।

ছবি-২৪ । গ্রামের নারীদের কর্ম সংস্থান (তেঁতুল বীজ সংগ্রহ) ।

২.৯ । খাদ্য নিরাপত্তায় অবদান ঃ উত্তোলিত বাগান থেকে বিভিন্ন প্রকার ফল ফলাদি উৎপাদিত হবে । উপকূলীয় জনগোষ্ঠীর পুষ্টি চাহিদা মিটাতে সক্ষম হবে যা খাদ্য নিরাপত্তা বিধানে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে ।

৩ । প্রযুক্তির নাম ঃ উপকূলীয় অঞ্চলে গোলপাতার বনায়ন কৌশলঃ

৩.১ । প্রযুক্তির বর্ণনাঃ

গোলপাতা (*Nypa fruticans*) পামি পরিবারভূক্ত একটি ম্যানগ্রোভ প্রজাতি যা সুন্দরবনসহ উপকূলীয় অঞ্চলের সর্বত্রই কম বেশী জন্মে থাকে । এর অর্থনৈতিক গুরুত্ব এবং উপযোগীতা অত্যন্ত বেশী । উপকূলীয় অঞ্চলে রাস্তার ধারে, পুকুর পাড়ে, বসতবাড়ীর আশেপাশের নীচু জায়গায় গোলপাতা বনায়ন অধিক লাভজনক, সহজ ও উপার্জন সহায়ক চাষ পদ্ধতি । অতি সহজে এগুলো সুন্দরবনের চেয়েও অধিক হারে বর্ধন সক্ষম প্রজাতি । এ প্রজাতির বনায়নের জন্য মার্চ-এপ্রিল মাসে গোলপাতা গাছ হতে বীজ কাঁদিসহ সংগ্রহ করে ৭-১০ দিন ছায়াযুক্ত পরিবেশে রেখে দিলে বীজ কাঁদি হতে ঝরে পড়ে এবং ইতোমধ্যেই বীজ অংকুরিত হয় । এ বীজ জোয়ার-ভাটার পানি উঠে এমন কাদাময় নার্সারিতে সরাসরি ডিবলিং পদ্ধতিতে লাগিয়ে দিলে ১-৩ মাসের মধ্যে উপযুক্ত চারা তৈরি হয় । জুন-জুলাই মাসে এ নার্সারি হতে চারা উঠিয়ে রাস্তার পার্শ্বে, পুকুর পাড়, বসতবাড়ীর আশেপার্শ্বে ও নীচু জলময় জলময় পরিবেশে রোপণ করে আর্থ সামাজিক উন্নয়ন, মাছ চাষ বৃদ্ধি, মাটি ক্ষয়রোধ এবং পরিবেশ ও প্রতিবেশ উন্নয়ন করা সম্ভব ।

৩.২। ভূমিকা (Introduction)

সুন্দরবন পৃথিবীর সুন্দরতম প্রাকৃতিকভাবে সৃষ্ট সর্বাপেক্ষা একক বৃহত্তম ম্যানগ্রোভ বন। এ বন বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে ৫,৭৭,০৫২ হেক্টর এলাকা জুড়ে এবং অনেক জীববৈচিত্রে সমৃদ্ধ। এখানকার বনজ সম্পদের অন্যতম এবং গুরুত্বপূর্ণ গাছ হচ্ছে গোলপাতা (*Nypa fruticans)*। গোলপাতা পামী (Palmae) পরিবারভূক্ত একটি উদ্ভিদ। গোলপাতা গাছ বেশী উঁচু হয়না। সাধারণতঃ এর পাতা ৩-৫ মিটার লম্বা হয় এবং দেখতে অনেকটা নারিকেল গাছের পাতার মতো। সুন্দরবনের তিনটি লবণাক্ত অঞ্চলেই গোলপাতা দেখা যায়। তবে ইহা মিষ্টি পানি অঞ্চল এবং পরিমিত বা মৃদু লোনা পানির অঞ্চলে বেশি জন্মায়। তীব্র লোনা পানির অঞ্চলে এ গাছ তুলনামূলকভাবে আকারে ছোট হয়। বন সংলগ্ন নদী বা খালের ধারে বা পানির মধ্যে নতুন চর বা দ্বীপে এ গাছ জন্মায়। গোলপাতা গাছ সুন্দরবন ছাড়াও এশিয়া, অস্ট্রেলিয়া, আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকার ম্যানগ্রোভ বনাঞ্চলে উৎপাদিত হয়। এ সব অঞ্চলে গোলপাতা গাছকে বানিজ্যিকভাবে অর্থাৎ অর্থকারী ফসল (Cash crop) হিসাবে চাষাবাদ করা হয়।

বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলের গ্রামীণ অর্থনীতিতে গোলপাতার ভূমিকা অপরিসীম এবং জাতীয় অর্থনীতিতেও এর যথেষ্ট ভূমিকা রয়েছে। সুন্দরবন সংলগ্ন এলাকার প্রায় ৫০ হাজার লোক গোলপাতার উপর নির্ভরশীল এবং এ অঞ্চলের প্রায় ৮০ শতাংশ ঘরবাড়ী গোলপাতা গাছের পাতা দিয়ে তৈরি করা হয়। গোলপাতা গাছ পরিবেশগত এবং শৈল্পিক দিক থেকেও গুরুত্ব বহন করে।

দরিদ্র এবং উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে গোলপাতার সহজ প্রাপ্যতা বাংলাদেশের জন্য সত্যিই এক আশির্বাদ স্বরূপ। নতুন নতুন সুযোগ সৃষ্টি তথা অর্থাগাম, কর্ম সংস্থান, সামাজিক উন্নয়ন, সম্পদের সদ্ব্যবহার, শিল্প উন্নয়নসহ কুটির শিল্পের বিপ্লব সাধনে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে সুন্দরবনের এই উপেক্ষিত প্রজাতি আজ এক অনন্য সম্পদে পরিণত হয়েছে।

গোলপাতা সুন্দরবনের এক অতিমূল্যবান প্রকৃতি প্রদত্ত সম্পদ যা হতে প্রতি বছর প্রায় ৫০ থেকে ৬০ লক্ষ টাকার রাজস্ব অর্জিত হয়। তুলনামূলকভাবে কমদাম, শক্ত ও টেকসই হওয়ার কারণে ঘরের ছাউনির কাজে গরীবের ঢেউটিন হিসাবে গোলপাতার জুড়ি মেলা ভার। বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলে ৩০টি জেলার মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত লোকের ঘরবাড়ী ও আশ্রয়স্থল নির্মাণে গোলপাতা অতি দরকারী কাঁচামাল।

গোলপাতার ব্যবহার বহুবিধ এবং এর গুরুত্ব অত্যাধিক। অতএব, এর বৈজ্ঞানিক উপায়ে ব্যবস্থাপনা, সংরক্ষণ ও চাষাবাদ একান্ত প্রয়োজন। তাই গোলপাতা গাছের গুরুত্ব উপলব্ধি করে সুন্দরবন ও উপকূলীয় অঞ্চলে এর উৎপাদন বৃদ্ধি, বংশবিস্তার, সংরক্ষণ ইত্যাদির উদ্দেশ্যে এ পুস্তিকা প্রকাশের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

৩.৩। গোলপাতার বিস্তার (Distribution of golpata)

পৃথিবীর সর্বত্র ম্যানগ্রোভ বনাঞ্চলে কমবেশী গোলপাতা জন্মে থাকে। আন্দামান, মায়ানমার, মালয়পেনিনসুলা, কুইন্সল্যান্ডের দক্ষিণ উপকূলীয় অঞ্চল, ভিয়েতনাম, ফিলিপাইন, শ্রীলংকা, পাপুয়ানিউগিনি প্রভৃতি অঞ্চলে গোলপাতা জন্মে থাকে।

বাংলাদেশের সুন্দরবনে সর্বত্রই গোলপাতা দেখা যায়। তবে অল্প লবণাক্ত অঞ্চলে সবচেয়ে বেশি জন্মে থাকে। শরণখোলা, চাঁদপাই, খুলনা ও সাতক্ষীরা সুন্দরবনের এ ৪টি রেঞ্জের মধ্যে কম লবণাক্ত অঞ্চলে অর্থাৎ শরণখোলা, খুলনা ও চাঁদপাই অঞ্চলে উঁচু মানের গোলপাতা জন্মে থাকে।

৩.৪। যে এলাকার জন্য ঃ উপকুলীয় অঞ্চল

৩.৫। প্রযুক্তির প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ ঃ ভূমি ক্ষয় রোধ, নদী ভাঙন রক্ষা, জ্বালানি, ঘরের ছাউনি, বেড়া নির্মাণ, কুটির শিল্পের প্রসার, মাছ ধরার উপকরণ, দূর্যোগ প্রতিরোধ, দারিদ্র্য বিমোচন, পরিবেশ ও আর্থ সামাজিক উন্নয়ন এবং উদ্ভাবিত প্রযুক্তিটি সহজে বাস্তবায়নযোগ্য।

৩.৬। অনুমোদিত উৎপাদন পরিচর্যা ঃ

(ক) জমির ধরণ/পানির অবস্থান ঃ খাল ও নদীর তীর, বাঁধ, রাস্তার ধার, ও চর এলাকা, বসতবাড়ির আশে পাশে যেখানকার মাটি অদ্র ও সিক্ত । জোয়ার ভাটা প্রবন এলাকায় এর বৃদ্ধি অনেক ভাল ।

(খ) মাটির বর্ণনা ঃ পলি ও কর্দমাক্ত মাটি ।

(ঙ) বাগান সৃজনের জন্য স্থান নির্বাচনঃ

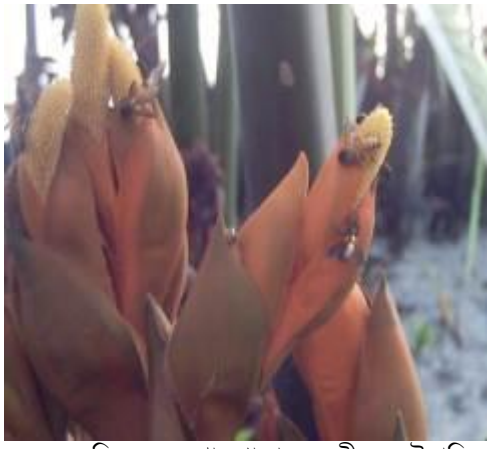

চিত্র-২৫ । গোলপাতার মঞ্জুরী ও ফুল । চিত্র-২৬ ।গোলপাতার ফুটন্ত মঞ্জুরী ও ফুল । চিত্র-২৭ ।গোলপাতার মঞ্জুরীতে মৌমাছি ।

চিত্র-২৮ ।গোলপাতার পাকা মঞ্জুরী । চিত্র-২৯ । গোলপাতার সংগৃহিত কাঁদি । চিত্র-৩০ । পাকা ফলের কাঁদি ওজন করা হচ্ছে ।

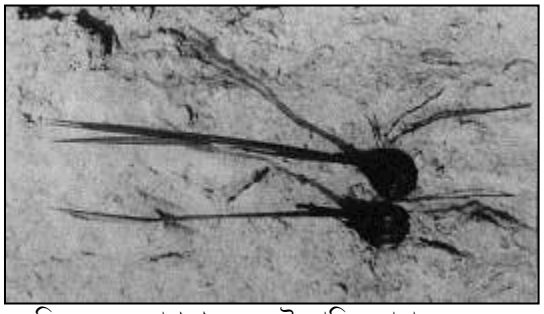

চিত্র-৩১ । নার্সারির জন্য সংগৃহিত বীজ । চিত্র-৩২ । রোপণের জন্য উত্তোলিত চারা ।

৩.৭। গোলপাতার বাগান সৃজন (Planting of golpata)

গোলপাতা সুন্দরবনে প্রাকৃতিকভাবে জন্মে থাকে। সুন্দরবন, সুন্দরবনের পার্শ্ববর্তী ও উপকূলীয় এলাকায় মোটামুটি লবণাক্ত অঞ্চল যেখানে জোয়ার ভাটার পানি দ্বারা প্লাবিত হয় সেখানেই গোলপাতা ভাল জন্মে। বর্তমানে এতদঞ্চলের স্থানীয় জনসাধারণ নিজস্ব জমিতে যেখানে জোয়ার ভাটার পানি দ্বারা প্লাবিত হয় এরূপ স্থানে ব্যক্তি উদ্যোগে গোলপাতার চাষ করা হচ্ছে।

সাম্প্রতিককালে বিভিন্ন কারণে সুন্দরবন এলাকায় অবস্থিত মাতৃ গোলপাতার গাছে বীজের ফলন কমে যাচ্ছে ফলে এ এলাকায় প্রাকৃতিকভাবে গোলপাতার বংশবিস্তার মারাত্মকভাবে হ্রাস পেয়েছে। তাই সুন্দরবনে বিভিন্ন এলাকায় নদী ও খালের পাড়ে খালি জায়গায় ও নতুন চরে গোলপাতার বাগান সৃজন করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে। উপকূলীয় বনায়ন এলাকায় ইতোমধ্যেই গোলপাতার চাষ শুরু হয়েছে এবং উহা খুবই আশাব্যাঞ্জক।

সুন্দরবনের যে সকল এলাকার নদী বা খালের ধারে জেগে উঠা চরে এখনও প্রাকৃতিকভাবে গোলপাতার আগমন ও বংশ বিস্তার ঘটেনি তথায় সাম্প্রতিককালে বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনস্টিটিউটের ম্যানগ্রোভ সিলভিকালচার বিভাগ কর্তৃক কৃত্রিমভাবে নার্সারিতে উত্তোলিত গোলপাতার চারা দ্বারা পরীক্ষামূলক বাগান সৃজনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এতে উৎসাহ ব্যাঞ্জক ও আশানুরূপ ফল পাওয়া গিয়েছে। গবেষণালব্ধ ফলাফলে দেখা গেছে সুন্দরবনের কম লবণাক্ত অঞ্চলের তৃণাচ্ছাদিত স্থায়ী চর এলাকা যেখানে সবসময় মাঝারি মাত্রার জোয়ার লক্ষ্য করা যায় এমন স্থান গোলপাতার বাগানসৃজনের জন্য সর্বাপেক্ষা উপযুক্ত। গবেষণায় আরো দেখা গেছে কম লবণাক্ত অঞ্চলে ১.৫ x ১.৫ মিটার দূরত্বে লাগানো চারার সর্বোচ্চ বাঁচার হার শতকরা ৭২.৭৬ ভাগ, মাঝারি লবণাক্ত অঞ্চলে এ হার শতকরা ৩১.৮২ ভাগ এবং অতি লবণাক্ত অঞ্চলে এ হার শতকরা ১৫.০ ভাগ। কৃত্রিমভাবে গোলপাতার বাগান সৃজনে যে সকল পদক্ষেপ গ্রহণ করা দরকার তার বিস্তারিত বিবরণ প্রদান করা হলো-

ক) স্থান নির্বাচন (Site selection)
খ) প্রস্তাবিত বাগান এলাকা প্রস্তুতকরণ (Preparation of land)
গ) চারা সংগ্রহ (Seedlings collection)
ঘ) চারা রোপণ (Planting of seedlings)
ঙ) বাগানের যত্ন (Care of planted seedlings)

ক) স্থান নির্বাচন (Site selection)

স্থান নির্বাচন কালে নিম্নোক্ত বিষয়ের প্রতি খেয়াল রাখতে হবেঃ

- খাল বা নদীর মোহনা ও কিনারায় জেগে ওঠা নতুন চর বা খালি জায়গা নির্বাচন করতে হবে।
- এসব এলাকায় জমি মোটামুটিভাবে সমতল ও উঁচু হতে হবে। নিচু, গর্ত বা বেশি ঢালু জমি পরিত্যাগ করা উচিত।
- নির্বাচিত জমির মাটি মোটামুটিভাবে শক্ত প্রকৃতির, কর্দমাক্ত এবং ঘাস প্রজাতি (যেমন-উরিঘাস, ধানশী, নলখাগড়া, মালিয়া ঘাস, হোগলা পাতা প্রভৃতি) দ্বারা আচ্ছাদিত হতে হবে। বেশি নরম মাটির জায়গা এবং ঘাস জন্মায়নি এমন জায়গা পরিহার করা উচিত।
- নির্বাচিত স্থানে জোয়ার ভাটার পানি দ্বারা প্লাবিত হতে হবে। অতিরিক্ত পলি পড়া স্থান এবং জোয়ার ভাটার পানি দ্বারা প্লাবিত হয় না এমন স্থান পরিত্যাগ করা উচিত।

খ) প্রস্তাবিত বাগান এলাকা প্রস্তুতকরণ (Preparation of land)

প্রস্তাবিত এলাকায় অবস্থিত জঙ্গল বিশেষ করে উরিঘাস, ধানশী, মালিয়া ঘাস, নলখাগড়া বা হোগলা পাতাসহ লতাপাতা ও অপ্রোজনীয় গাছগুলো কেটে ফেলতে হবে। কর্তিত জঙ্গল এলাকা নদী বা খালের তীরবর্তী নীচু হওয়ায় প্রতিনিয়ত জোয়ার ভাটার দ্বারা প্লাবিত হওয়ার কারণে কর্তিত জঙ্গলসমূহ জোয়ারের পানিতে ভাসিয়ে দিতে হবে। নতুবা একটি নির্দিষ্ট স্থানে স্তুপাকারে জমা করে রেখে দিলে পরবর্তীতে উহা পঁচে গিয়ে জমিতে জৈব/সবুজ সারে পরিণত হবে। এতে করে প্রস্তাবিত বাগান এলাকা সম্পূর্ণভাবে আগাছা মুক্ত হবে। ফলে গোলপাতার চারা লাগানোর জন্য পরবর্তী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

১) চারা লাগানোর প্রয়োজনীয় দূরত্ব ঃ গোলপাতার চারার মধ্যবর্তী ও সারির দূরত্ব কত হবে তা নির্ভর করে মডেল ও ভবিষ্যতে গাছগুলোর ব্যবহারের উপর। সাধারণতঃ প্রাকৃতিকভাবে জন্মানো এবং পরীক্ষামূলকভাবে সৃজিত বাগানে লাগানো গোলপাতার গাছে বৃদ্ধির পর্যবেক্ষণ অনুযায়ী চারার মধ্যবর্তী ও সারির দূরত্ব ২ মিটার x ২ মিটার উত্তম বলে বিবেচিত হয়েছে। এ দূরত্ব হিসেবে প্রতি হেক্টর বাগান সৃজনে ২৫০০টি গোলপাতার চারার প্রয়োজন।

২) চারা লাগানোর উপযুক্ত সময় ঃ গোলপাতার মাতৃগাছে সাধারণঃ মার্চ-এপ্রিল মাসে পরিপক্ক বীজ পাওয়া যায় তখন তা সংগ্রহপূর্বক প্রস্তুতকৃত নার্সারিতে বপন দ্বারা চারা উত্তোলন করা হয়। চারার বয়স যখন ৩/৪ মাস হয় তখন উহা লাগানোর উপযুক্ত সময় বলে বিবেচিত হয়। এরূপ বয়সের চারাতে ২/৩টি করে পাতা গজায়, বীজগুলো চারাতে সংযুক্ত থাকে এবং চারার উচ্চতা ১ফুট থেকে ১.৫ ফুট হয়ে থাকে। এরূপ উচ্চতা বিশিষ্ট গোলপাতার চারা আগস্ট বা সেপ্টেম্বর মাসে লাগানোর সর্বোত্তম সময়। কারণ প্রস্তাবিত বাগান এলাকায় লাগালে জোয়ার ভাটায় কম পলিমাটি দ্বারা লাগানো চারাগুলো আবদ্ধ হলেও একেবারে চারা সম্পূর্ণ দেহটি মাটির নীচে চলে যাবে না। ফলে চারাগুলো পরিমিত আলো বাতাস পেয়ে দ্রুত বৃদ্ধি লাভে সক্ষম হবে। অনেক ক্ষেত্রে বন বিভাগের লোকজন সরাসরি বীজ বা অংকুরিত বীজ প্রস্তাবিত বাগান এলাকায় এপ্রিল/মে মাসে সরাসরি বপন করে। এক্ষেত্রে জোয়ার ভাটার তীব্রতায় এবং পলিমাটির অধিক স্তরীভূত হওযায অংকুরিত চারা সময়ের ব্যবধানে মাটির অনেক নীচে তলিয়ে যায় এবং বাগান সৃজন ব্যর্থতায় পর্যবশিত হয়।

৩) স্ট্যাকিং ও গর্ত খনন ঃ বাগান এলাকা প্রস্তুতের পরই মডেল ও দূরত্ব অনুসারে (২মিটার x ২মিটার) রশি দ্বারা মেপে নির্দিষ্ট স্থানে জঙ্গল থেকে সংগৃহীত গরানের খুঁটি বসাতে হবে (স্ট্যাকিং)। এক হেক্টর বাগানের জন্য উপরোক্ত দূরত্ব অনুসারে প্রায় ২৫০০টি খুঁটি প্রয়োজন হবে। চারা লাগানোর পূর্বে স্ট্যাকিংসমূহের (খুঁটির) গোড়াতে হালকা গর্ত (নরম/কাদামাটির ক্ষেত্রে) বা প্রয়োজনীয় গর্ত (মাটি শক্ত হলে) করে নিতে হবে এবং গর্তের পাশে খুঁটি বা স্ট্যাকিংগুলো পুতে রাখতে হবে। গর্তের গভীরতা এমন হতে হবে যাতে চারাতে সংযুক্ত বীজটি মাটির নীচে প্রবেশ করে।

গ) চারা সংগ্রহ (Seedlings collection)

ইতিপূর্বে নার্সারিতে উত্তোলিত ৩/৪ মাস মাস বয়সের গোলপাতার চারাগুলো খুব সতর্কতার সাথে কাঁদামাটি থেকে তুলতে হবে যাতে চারাতে সংযুক্ত বীজটি ঝরে পড়ে না যায়। চারাগুলো তোলার পর তার নগ্ন শিকড়ের কাদামাটিগুলো পানিতে ধুয়ে পরিষ্কার করে নিতে হবে। অতঃপর যথাসম্ভব দ্রুত সময়ের মধ্যে প্রস্তাবিত বাগান এলাকায় লাগানোর জন্য দেশীয় খোলা নৌকাযোগে পরিবহন করতে হবে। চারা এলাকায় পৌঁছানোর পর লাগানোর নিমিত্তে ঝুড়িতে করে সতর্কতার সাথে প্রতিটি গর্তে সরবরাহ করতে হবে। প্রস্তাবিত বাগান এলাকার নিকটবর্তী উপযুক্ত স্থানে নার্সারি সৃজন করা উচিত যাতে কম সময়ে চারাগুলো এলাকায় পৌঁছানো সম্ভব হয়।

ঘ) চারা রোপণ (Planting of seedlings)

সুন্দরবন তথা উপকূলীয় এলাকায় বর্ষাকালের পর আগস্ট-সেপ্টেম্বর মাস গোলপাতার চারা লাগানোর উপযুক্ত সময়। গোলপাতার চারাগুলো সাবধানে গর্তে বসিয়ে চারার পার্শ্বের মাটি দ্বারা চারার গোড়াতে কচ্ছপের পিঠের মত সামান্য উঁচু (২″ - ৩″) করে ঢেকে দিতে হবে যাতে চারার সংযুক্ত বীজটি ও নগ্ন শিকড়গুলো মাটির অভ্যন্তভাগে প্রবিষ্ট থাকে। চারাগুলো রোপণের পর চারাকে স্ট্যাকিং খুঁটির সাথে রশি দ্বারা বেঁধে দিতে হবে যাতে চারাটি বা তার পাতাগুলো বাতাসে হেলে না পড়ে।

ছবি-৩৩ । বেড়ী বাঁধে নদীর পার্শ্বে সৃজিত গোলপাতা বাগান ।

ঙ) বাগানের যত্ন (Care of planted seedlings)

গোলগাছের চারা রোপণের পর চারার পরিচর্যা ও রক্ষণাবেক্ষণ অপরিহার্য । একটি সফল বাগান প্রতিষ্ঠা করার জন্য ৪ বছর যাবৎ কঠোর সতর্কতার সাথে ব্যবস্থাদি গ্রহণ করতে হবে । চারাগাছের সংরক্ষণ ও পরিচর্যার জন্য নিম্নোক্ত ব্যবস্থাগুলো পর্যায়ক্রমিকভাবে অনুসরণ করা আবশ্যকঃ-

১) আগাছা নিয়ন্ত্রণ ঃ উষ্ণ মন্ডলীয় আবহাওয়ায় আগাছা ও লতাপাতা দ্রুত বৃদ্ধি পাওয়ায় রোপণকৃত চারার স্বাভাবিক বৃদ্ধি ব্যাহত হয় । সৃজিত বাগান সমূহে আগাছা নিয়ন্ত্রণে দিন মজুর নিয়োগ করে ১ম বছরে ৪ বার (৩ মাস অন্তর), ২য় বছরে ৩ বার (৪ মাস অন্তর), ৩য় ও ৪র্থ বছরে ২ বার (৬ মাস অন্তর) আগাছা বাছাই করলে ভাল হয় । উল্লেখ্য যে, চরাঞ্চলে গোলপাতার বাগানে পলিযুক্ত মাটিতে ঘাস জাতীয় আগাছার দ্রুত বৃদ্ধি ঘটায় তা দমনে যথা সময়ে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে ।

২) গরু ছাগল ও বন্যপশুর উপদ্রব নিয়ন্ত্রণ ঃ গোলপাতার চারার মোথা বন্য শুকরের প্রিয় খাদ্য বিধায় তা ভক্ষণের জন্য এ প্রাণীর বিচরণ ঘটে থাকে এবং ক্ষতির সম্ভনা থাকে । এ প্রাণীরা মোথা খাওয়ার জন্য সম্পূর্ণ চারাটি নষ্ট করে ফেলে । তাই সৃজিত বাগানে ঘেরা বেড়ার পরিবর্তে লেকবলের দ্বার পাহারার ব্যবস্থা করা গেলে বন্য শুকরের উপদ্রব বহুলাংশে কমে যাবে । এ ছাড়া সৃজিত বাগানে গরু ছাগলের উপদ্রব হতে প্রয়োজনে ঘেরা বেড়া প্রদান করতে হবে ।

৩) শূন্যস্থান পূরণ ঃ চারা রোপণের প্রথম বছরে ১০০% জীবিত চারা পাওয়া যায় না । বিভিন্ন কারণে কিছু চারা মারা যায় । তাই যেখানে চারা মারা যাবে সেখানে ১ম/২য় বছরের মধ্যে চারা রোপণের মাধ্যমে শূন্যস্থান পূরণ করতে হবে ।

৪) ভাসমান কচুরীপানা ও শেওলার উপদ্রব ঃ সুন্দরবন তথা উপকূলীয় এলাকায় কম লবণাক্ত পানিতে বর্ষাকাল শেষে শুষ্ক মৌসুমের শুরুতে হাওড়-বিল থেকে আগত প্রচুর কচুরীপানা এবং শেওলা বা আগাছা জোয়ার-ভাটার পানিতে চরাঞ্চলে সৃজিত গোলপাতার বাগানে প্রবেশ করে থাকে। এতে ভাসমান কচুরীপানা বা আগাছার চাপে রোপণকৃত চারাগুলো নীচে পড়ে গিয়ে মারা যায়। এছাড়া পর্যাপ্ত শেওলা চারাগুলোকে আকড়িয়ে আড়ষ্ট করে মেরে ফেলে। এদের উপদ্রব থেকে চারাগুলোকে রক্ষার জন্য প্রয়োজন ঘেরাবেড়া বা লোকবল দ্বারা প্রতিনিয়ত কচুরীপানা, আবর্জনা ও শেওলামুক্ত রাখা।
৫) রোগ-বালাই দমন ঃ চারাগাছ পোকামাকড় বা ছত্রাক দ্বারা আক্রান্ত হলে প্রয়োজনীয় কীটনাশক বা ছত্রাকনাশক ঔষধ প্রয়োগ করতে হবে।
৬) শুকনা পাতা ছাটাই ঃ বাগান উত্তোলনের ২য় বা ৩য় বর্ষে গাছের গোড়ার শুকনা পাতাগুলো ধারাল কাঁচি বা ছুরি দ্বারা কেটে ফেলতে হবে। এতে গাছগুলো সুস্থ ও সবলভাবে বেড়ে উঠবে।

৩.৮। প্রযুক্তির ঝুঁকির বিবরণ ঃ উপকূলীয় অঞ্চলে গোলপাতা রোপণের ফলে অন্য প্রজাতির গাছের কোন ক্ষতি হয় না বিধায় এ প্রযুক্তিটি প্রয়োগে কোন ঝুঁকি নেই।

৩.৯। পরিবর্তনশীল আবহাওয়ায় উপযোগিতা ঃ চর সুরক্ষা, নদী ভাঙন রোধ, পুকুর পাড় রক্ষা, নতুন চর টেকসই করণ ও জলবায়ু পরিবর্তন জনিত সমস্যা মোকাবেলায় সহযোগী ভূমিকা পালন করবে।

৩.১০। নারীদের অংশগ্রহণের উপযোগিতা ঃ সৃজিত বাগানেরে কাচামাল ব্যবহার করে নালীরা বিভিন্ন ধরনের কুঠির শিল্পের কাজে অংশ গ্রহণ করে থাকে। কর্মসংস্থানের যথেষ্ট সুযোগ সৃস্টি হয়, সচ্ছলতা বাড়ে এবং সর্বপরি নারীদের আর্থ সামাজিক উন্নয়ন ঘটে।

৩.১১। খাদ্য নিরাপত্তায় অবদান ঃ উত্তোলিত বাগান থেকে গোল ফল পাওয়া যায় যা খাদ্য হিসাবে ব্যবহৃত হয়। গোল গাছ হইতে আহরিত রস হতে গুড় উৎপাদন হয় এমনকি রস থেকে ভিনিগার উৎপাদন করা সম্ভব।

৪। প্রযুক্তির নাম ঃ সুন্দরবনের খলসি প্রজাতির বনায়ন কৌশলঃ

৪.১। প্রযুক্তির বর্ণনাঃ উপকূলীয় অঞ্চলের নদী, খাল, রাস্তা ও বাড়ীর আশে পার্শ্বে পুকুরপাড়, নীচু জায়গায় মধুবৃক্ষ নামে পরিচিত খলসি বৃক্ষের বনায়ন অত্যন্ত লাভজনক। উল্লেখ্য সুন্দরবনের পশ্চিম অংশে লবণাক্ত অঞ্চলে খলসি প্রজাতি যত্রতত্র নদীর কিনারে জম্মে থাকে। সুন্দরবন হতে বছরে প্রায় ২০০ মেট্রিকটন মধু উৎপাদিত হয়। এ প্রজাতির বৃদ্ধি অলবণাক্ত বা মৃদু লবণাক্ত অঞ্চলেও বর্ধিত হারে জম্মে থাকে। এমনকি বসতবাড়ীর আশে পার্শ্বে পুকুর পাড়ে, বাঁধ ও রাস্তার পার্শ্বে খলসি গাছের বৃদ্ধি অধিক হারে লক্ষনীয় এবং মধু উৎপাদন সহায়ক এ প্রজাতির নার্সারি উত্তোলন কৌশল খুবই সহজ। জুলাই-আগস্ট মাসে বীজ বা প্রপাগিউল সংগ্রহ করে পলিব্যাগে সরাসরি সংগৃহীত বীজ বা প্রপাগিউল ডিবলিং পদ্ধতিতে লাগিয়ে দিলেই কয়েক দিনের মধ্যেই চারা গজায় এবং অপেক্ষাকৃত অল্প যত্নে এক বছর পরই উক্ত চারা রোপণ করে খলসি গাছ রোপণ করা লাভজনক ও মধু উৎপাদন করা সম্ভব। মধু অর্থকারী বিধায় খলসি গাছের বনায়ন করে আর্থসামাজিক উন্নয়ন ও জীববৈচিত্র সমৃদ্ধ ও প্রতিবেশ উন্নয়ন সহায়ক।

৪.২। যে এলাকার জন্য ঃ উপকুলীয় অঞ্চল
৪.৩। প্রযুক্তির প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ ঃ খলসি প্রজাতির দ্বারা নতুন চরে সহজে কম খরচে বাগান সৃজন, চর সুরক্ষা, দ্রুত বনায়নের মাধ্যমে মধু উৎপাদন তরান্বিত করন এবং প্রযুক্তিটি সহজে বাস্তবায়ন যোগ্য।
৪.৪। খলসি প্রজাতির দ্বারা বাগান সৃজনঃ

ছবি-৩৪ । খলসি গাছের পুষ্প মঞ্জুরী ও প্রপাগিউল ।

ছবি-৩৫ । খলসির নার্সারি ।

ছবি-৩৬ । খলসি প্রজাতির বাগান উত্তোলন ।

সফলভাবে খলসি প্রজাতির বাগান উত্তোলনের জন্য নিম্নোক্ত পদ্ধতি সমূহ অনুসরণ করতে হবে ঃ-

(ক) বাগান সৃজনের স্থান নির্বাচন ঃ

- যে এলাকায় বাগান সৃজন করতে হবে সেই এলাকা ২/৩ মাস পূর্বেই নির্বাচন করে রাখতে হবে ।
- স্থান নির্বাচনের সময় জমির শ্রেণী ও বনায়নের উপযোগীতা আছে কিনা যাচাই করতে হবে ।

(খ) বাগান সৃজনের পূর্বে নির্বাচিত এলাকা জরিপ এবং পরিকল্পনা গ্রহন করতে হবে:-

- কি পরিমান জমি বনায়ন করা হবে ।
- ভূমির প্রকার, অবস্থান এবং মাটির প্রকৃতি ।
- বর্তমান গাছপালা এবং অতিতের গাছপালা ।
- নির্বাচিত জমি কতটুকু প্রস্তুত করতে হবে তা নির্ধারণ করা ।
- রাস্তা, পায়ে চলার পথ, পানি সেচের ব্যবস্থা ইত্যাদি ।

(গ) বাগান সৃজনের স্থান প্রস্তুতকরণ ঃ

- নির্বাচিত এলাকার জঙ্গল, লতাপাতা ও অপ্রয়োজনীয় গাছপালা জানুয়ারী মাসে একবার কেটে ফেলতে হবে ।
- বড় গাছের মোথা থাকলে তুলে ফেলতে হবে ।
- কর্তিত জঙ্গল শুকিয়ে গেলে প্রয়োজনবোধে আগুন দ্বারা পুড়িয়ে ফেলতে হবে ।
- চারা লাগানোর পূর্বে যদি পুনরায় আগাছা জন্মে তাহলে আবার আগাছা ২য় বার পরিস্কার করতে হবে ।

(ঘ) খলসি চারা রোপণের সময় ঃ

- বর্ষা মৌশুমের শুরুতে অর্থাৎ মে-জুন মাসে খলসি চারা লাগানোর উপযুক্ত সময় । তবে আগষ্ট-সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত চারা লাগানো যেতে পারে ।
- উপকূলীয় এলাকায় বর্ষাকালের পর সেপ্টেম্বর মাসে খলসি চারা লাগানো ভাল ।

(ঙ) স্টেকিং করা ঃ

- স্টেকিং করার মূল উদ্দেশ্য হলো চারা রোপণের স্পট চিহ্নিতকরণ, রোপিত চারাকে খুঁটির সাথে বেধেঁ রাখা এবং মরে যাওয়া চারার স্থান চিহ্নিতকরণ ।
- নির্বাচিত স্থান প্রস্তত করার পর সম্পূর্ণ এলাকায় মে মাসের প্রথম ভাগেই চারা রোপণের স্পটগুলি চিহ্নিতকরণের জন্য নিয়মিত দুরত্বে স্টেকিং করতে হবে ।
- এ কাজে ১ মি. লম্বা বাঁশের সরু খুঁটি বা কোন গাছের সরু ডালা ব্যবহার করা যেতে পারে ।

(চ) খলসি চারা রোপণের জন্য গর্ত তৈরী করা ঃ

- বর্ষা শুরু হওয়ার আগে প্রতিটি ষ্টেকিং করা খুঁটির গোড়ায় গর্ত তৈরী করতে হবে ।
- গর্তের আকার ৬"× ৬" × ৬" আয়তনের হবে এবং গর্তের পার্শ্বে খুঁটিগুলি পুঁতে রাখতে হবে ।
- লক্ষ্য রাখতে হবে যেন গর্ত যেন ১৫-২০ দিন ঠিক মত আলো বাতাস পায় ।

(জ) সার প্রয়োগ ঃ

- গর্ত হইতে উঠানো টালকৃত মাটির নীচের অংশ প্রথমে এবং উপরের অংশ পরে দিয়ে গর্ত ভরাট করতে হবে ।
- প্রতিটি গর্তে ১/২ কেজি গোবর বা কম্পোস্ট সার, ১০ গ্রাম ইউরিয়া, ১০ গ্রাম টিএসপি এবং ০৫ গ্রাম এমপি সার প্রতিটি গর্তে প্রয়োগ করে কোদাল দ্বারা মাটির সাথে ভালভাবে মিশাতে হবে ।
- খলসি চারা লাগানোর ন্যুন্যতম ১০-১৫ দিন পূর্বে সার প্রয়োগ করতে হবে ।
- সারের পরিমাণ মাটির প্রকার ভেদে কম বেশী হয়ে থাকে ।

(ঝ) খলসি চারা লাগানোর প্রয়োজনীয় দুরত্ব ঃ

- খলসি চারা লাগানোর জন্য উত্তম দুরত্ব হলো ৪ × ৪ ।

(ঞ) চারা রোপণ পদ্ধতি ঃ

- নার্সারী থেকে চারাগুলো সতর্কতার সাথে বাগান করার স্থানে নিয়ে যেতে হবে ।
- চারা লাগানোর সময় ব্লেড বা ধারাল ছুরি দিয়ে পলিথিন ব্যাগটি কেটে নিয়ে ব্যাগটি ফেলে দিতে হবে । তারপর জমাট বাঁধা মাটিসহ চারাটি গর্তে ঠিকমত বসিয়ে চারপাশের মাটি চারার গোড়ায় সামান্য উঁচু করে চেপে দিতে হবে ।
- খেয়াল রাখতে হবে চারা লাগানোর সময় যেন মাটির বল ভেঙ্গে না যায় এবং চারার শিকড় গর্তের ভিতরে পেঁচিয়ে না যায় ।
- চারা রোপণের পর সহায়ক খুঁটির সাথে রশি দিয়ে বেঁধে দিতে হবে যাতে চারা হেলে যেতে না পারে ।

৪.৫ । সৃজিত খলসি বাগানের পরিচর্যা ও রক্ষণাবেক্ষণ

চারা রোপণের পর এর পরিচর্যা ও রক্ষণাবেক্ষণ একান্ত অপরিহার্য । চারাগাছের সংরক্ষণ ও পরিচর্যার জন্য নিম্নোক্ত ব্যবস্থাগুলো অনুসরণ করতে হবে ঃ

(ক) পানি সরবরাহ ঃ

- চারা লাগানোর পর পানি দিয়ে চারার গোড়া ভিজিয়ে দিতে হবে ।
- বৃষ্টি না হলে প্রয়োজন অনুযায়ী চারার গোড়ায় পানি দিতে হবে ।
- শুষ্ক মৌসুমে মাটিতে রস না থাকলে চারা গাছ মারা যেতে পারে তাই নিয়মিত পানি সেচের ব্যবস্থা করতে হবে ।

(খ) আগাছা দমন ঃ

- সৃজিত বাগানে নিয়মিত আগাছা পরিস্কার করা অত্যাবশ্যক ।
- আগাছা নিয়ন্ত্রনে রাখতে চারা রোপণের ১ম বছরে ৩ বার এবং পরবর্তী বছর সমূহে ২ বার করে আগাছা পরিস্কার করতে হবে ।
- চারা গাছ প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত এ প্রক্রিয়া চালু রাখতে হবে ।

(গ) ঘেরাবেড়া দেওয়া ঃ

- গৃহপালিত গবাদিপশু এবং বণ্য প্রাণী যেমন হরিণ বাগানের চারাগাছ খেয়ে ধ্বংস করে ফেলতে পারে । তাই বাগান এলাকার চারিপাশে বেড়া দিতে হবে ।
- চারার উচ্চতা বণ্য ও গৃহপালিত প্রাণীর নাগালের বাইরে যাওয়া পর্যন্ত বেড়া রাখতে হবে
- বড় ধরণের বাগান সংরক্ষণের জন্য পাহারাদার নিয়োগ করা যেতে পারে ।

(ঘ) মাটি আলগা করণ ঃ

- রোপণকৃত চারার গোড়ার মাটি শক্ত হয়ে গেলে তা মাঝে মাঝে নিড়ানী দ্বারা আলগা করে দিতে হবে ।
- এ কাজ সাধারণতঃ বছরে ২ বার করা হয় ।

(ঙ) শুন্যস্থান পূরণ ঃ

- চারা রোপণের ১ম বছরে ১০০% জীবিত চারা পাওয়া যায় না। বিভিন্ন কারণে কিছু চারা মারা যায়।
- যেখানে চারা মারা যাবে সেখানে ১ম/২য় বছরে নতুন চারা রোপণের মাধ্যমে পূরণ করতে হবে।
- এজন্য নার্সারিতে পর্যাপ্ত চারা আগে থেকেই বড় ব্যাগে উত্তোলন করে সংরক্ষণ করে রাখতে হবে।
- শুন্যস্থান পূরণের জন্য চারার বয়স কমপক্ষে ১ বছর হওয়া উচিত।

(চ) রোগ-বালাই দমন ঃ

- চারাগাছ পোকামাকড় বা ছত্রাক দ্বারা আক্রান্ত হয়ে বিভিন্ন রকমের রোগ বালাই-এর শিকার হতে পারে।
- বেশীরভাগ ক্ষেত্রে চারাগাছের আক্রান্ত অংশ কেটে পুড়িয়ে বা মাটিতে পুতে ফেলতে হবে।
- রোগের পরিমান বেশী হলে কীটনাশক বা ছত্রাকনাশক অনুমোদিত মাত্রায় প্রয়োগ করতে হবে।

৪.৬। প্রযুক্তির ঝুঁকির বিবরণ ঃ উপকূলীয় অঞ্চলে এ প্রযুক্তি প্রয়োগে কোন ঝুঁকি নেই।

৪.৭। পরিবর্তনশীল আবহাওয়ায় উপযোগিতা ঃ উপকূলীয় অঞ্চলে সর্বত্রই জন্মে, চার বছরের গাছে ফুল ধরে এবং মধু উৎপাদন শুরু হয়, ভূমি উন্নয়ন করে এবং জলবায়ু পরিবর্তনজনিত সমস্যা মোকাবেলায় সহযোগী ভূমিকা পালন করবে।

৪.৮। নারীদের অংশগ্রহণের উপযোগিতা ঃ মধু উৎপাদন কাজে সহজেই নারীরা অংশ গ্রহণ করে বাড়তি আয়ের সুযোগ করে নিতে পারে। নারীদের আর্থ সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন ঘটে।

৪.৯। খাদ্য নিরাপত্তায় অবদান ঃ উত্তোলিত বাগান থেকে মধু উৎপাদিত হয় যা পুষ্টি চাহিদা মিটাতে সক্ষম হবে এবং খাদ্য নিরাপত্তা বিধানে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।

৫। প্রযুক্তির নাম ঃ নদী ও খালের কিনারে এবং নতুন চরে বনায়নের কৌশলঃ

৫.১। প্রযুক্তির বর্ণনাঃ উপকুলীয় অঞ্চলের ফাঁকা জায়গা বিশেষ করে নদীর কিনারে ও চরে ম্যানগ্রোভ, সফেদাসহ সকল প্রকার টক ফল ও জোয়ার ভাটা সহনশীল প্রজাতির চারা রোপণের মাধ্যমে নদী, খাল, বাঁধ ও চর সংরক্ষণসহ মাটি ক্ষয় রোধ করে পরিবেশ ও প্রতিবেশীয় উন্নয়ন ঘটানো সম্ভব।

৫.২। যে এলাকার জন্য ঃ উপকুলীয় অঞ্চল

৫.৩। প্রযুক্তির প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ ঃ ভূমি ক্ষয় রোধ, জ্বালানি ও কাঠের চাহিদা পূরণ, দূর্যোগ প্রতিরোধ, পরিবেশ ও আর্থ সামাজিক উন্নয়ন এবং উদ্ভাবিত প্রযুক্তিটি সহজে বাস্তবায়নযোগ্য।

৫.৪। অনুমোদিত উৎপাদন পরিচর্যা ঃ

(ক) জমির ধরণ/পানির অবস্থান ঃ খাল ও নদীর তীর, বাঁধ, রাস্তার ধার, ও চর এলাকা সহ নিয়মিত জোয়ার ভাটা প্রবন এলাকা।

(খ) মাটির বর্ণনা ঃ অ্যালুভিয়াল সয়েল।

(ঙ) রোপণ ঘনত্ব/ গাছের দূরত্ব ঃ প্রজাতি ভেদে ২মিটার হতে ৫ মিটার দূরত্বে রোপণ যোগ্য।

(চ) বীজের উৎস ঃ সুন্দরবন বনাঞ্চল এবং স্থানীয় মাতৃবৃক্ষ।

(ছ) বপন/রোপণ সময় ঃ প্রধানত বর্ষাকাল (জুন থেকে সেপ্টেম্বর)।

(ঞ) ব্যবস্থাপনা ও অন্যান্য পরিচর্যা ঃ ক্ষেত্র বিশেষে বেড়া দেওয়া, আগাছা পরিস্কার এবং পোকা মাকড়ের আক্রমনে কীটনাশক ব্যবহার করা প্রয়োজন।

ছবি-৩৭ । বনায়ন উপযোগী নতুন চর ।

ছবি-৩৮ । বনায়ন উপযোগী বিস্তীর্ণ নতুন চর ।

ছবি-৩৯ । ছোট খালের উভয় কিনারে ছৈলা প্রজাতির বনায়ন ।

ছবি-৪০ । চরে ম্যানগ্রোভ প্রজাতির বনায়ন ।

৫.৫ । প্রযুক্তির ঝুঁকির বিবরণ ঃ উপকূলীয় অঞ্চলে এ প্রযুক্তি প্রয়োগে কোন ঝুঁকি নেই ।

৫.৬ । পরিবর্তনশীল আবহাওয়ায় উপযোগিতা ঃ জলবায়ু পরিবর্তন জনিত সমস্যা মোকাবেলায় সহযোগী ভূমিকা পালন করবে ।

৫.৭ । নারীদের অংশগ্রহণের উপযোগিতা ঃ নারীদের কর্মসংস্থানের যথেষ্ট সুযোগ সৃস্টি হবে এবং আর্থ সামাজিক উন্নয়ন ঘটবে ।

৫.৮ । খাদ্য নিরাপত্তায় অবদান ঃ উত্তোলিত বাগান থেকে বিভিন্ন প্রকার ফল ফলাদি উৎপাদিত হবে যা পুষ্টি চাহিদা মিটাতে সক্ষম হবে এবং খাদ্য নিরাপত্তা বিধানে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে ।

৬ । প্রযুক্তির নাম ঃ সুন্দরবনসহ উপকূলীয় কম উদ্ভিজ্জ অঞ্চলে ম্যানগ্রোভ প্রজাতির বনায়ন কৌশলঃ

৬.১ । প্রযুক্তির বর্ণনাঃ সুন্দরবনসহ উপকূলীয় ম্যানগ্রোভ অঞ্চলে কম চারাযুক্ত বা আদৌ জন্মায়না এমন জায়গায় ম্যানগ্রোভ প্রজাতির দ্বারা বনায়নের মাধ্যমে সুন্দরবনসহ সমগ্র উপকূলীয় অঞ্চলের উদ্ভিজ্জ সম্ভার সৃষ্টি, প্রাণী কূলের আস্তানা সৃজন, উপকূলীয় অঞ্চলের প্রাণ বৈচিত্র উন্নয়ন ও সংরক্ষণ করা বাস্তবতার নিরিখে সমীচীন ।

৬.২। যে এলাকার জন্য ঃ উপকুলীয় অঞ্চল

৬.৩। প্রযুক্তির প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ ঃ ভূমি ক্ষয় রোধ, জ্বালানি ও কাঠের চাহিদা পূরণ, দূর্যোগ প্রতিরোধ, পরিবেশ ও আর্থ সামাজিক উন্নয়ন এবং উদ্ভাবিত প্রযুক্তিটি সহজে বাস্তবায়নযোগ্য।

৬.৪। অনুমোদিত উৎপাদন পরিচর্যা ঃ

(ক) জমির ধরণ/পানির অবস্থান ঃ সুন্দরবনের কম গাছযুক্ত এলাকা, খাল ও নদীর তীর, বাঁধের ধার, চর এলাকাসহ নিয়মিত জোয়ার ভাটা প্রবন এলাকা।

ছবি-৪১। সুন্দরবনের নদী তীরে বনায়ন উপযোগী চর।

ছবি-৪২। সুন্দরবনে উত্তোলিত কিরপা বাগান।

ছবি -৪৩। বগীতে উত্তোলিত সুন্দরী প্রজাতির বাগান।

ছবি -৪৪। ঢাংমারীতে উত্তোলিত সুন্দরী বাগান।

ছবি -৪৫। সুন্দরবনে উত্তোলিত কিরপা প্রজাতির বাগান।

ছবি-৪৬। সুন্দরবনে উত্তোলিত ঝানা প্রজাতির বাগান।

(খ) মাটির বর্ণনা ঃ কর্দমাক্ত পলিমাটি ।

(ঙ) রোপণ ঘনত্ব/ গাছের দূরত ঃ প্রজাতি ভেদে ১মিটার হতে ৩ মিটার দূরত্বে রোপণ যোগ্য ।

(চ) বীজের উৎস ঃ সুন্দরবন বনাঞ্চল এর মাতৃবৃক্ষ ।

(ছ) বপন/রোপণ সময় ঃপ্রধানত বর্ষা কাল (জুন থেকে সেপ্টেম্বর) ।

(ঞ) ব্যবস্থাপনা ও অন্যান্য পরিচর্যা ঃ ক্ষেত্র বিশেষে বেড়া দেওয়া, আগাছা পরিস্কার এবং পোকা মাকড়ের আক্রমনে কীটনাশক ব্যবহার করা প্রয়োজন ।

৬.৫ । প্রযুক্তির ঝুঁকির বিবরণ ঃ উপকূলীয় অঞ্চলে এ প্রযুক্তি প্রয়োগে কোন ঝুঁকি নেই ।

৬.৬ । পরিবর্তনশীল আবহাওয়ায় উপযোগিতা ঃ কম ঘনত্বের বনাঞ্চলে ম্যানগ্রোভ চারা দ্বারা বনায়নের ফলে পরিবেশ সবুজে ভরে উঠবে । পরিবেশ ও প্রতিবেশের ভারসাম্য রক্ষা হবে । সর্বপরি জলবায়ু পরিবর্তন জনিত সমস্যা মোকাবেলায় সহযোগী ভূমিকা পালন করবে ।

৬.৭ । নারীদের অংশগ্রহণের উপযোগিতা ঃ নারীদের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃস্টি হবে এবং আর্থ সামাজিক উন্নয়ন ঘটবে ।

৬.৮ । খাদ্য নিরাপত্তায় অবদান ঃ উত্তোলিত বাগান থেকে উৎপাদিত কেওড়া এবং গোল গাছের ফল খাদ্য হিসাবে ব্যবহৃত হয় । গোল গাছ হইতে আহরিত রস দ্বারা গুড় উৎপাদন করা হয় । যা পুষ্টি চাহিদা মিটাতে সক্ষম হবে এবং খাদ্য নিরাপত্তা বিধানে ভূমিকা পালন করবে ।